একক—১ ❐ রাজনীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও দৃষ্টিভঙ্গি

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ রাজনীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

১.১.১ রাজনীতিবিজ্ঞান হ'ল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিজ্ঞান

১.১.২ রাজনীতিবিজ্ঞান সর্বজনিক বিষয়ের বিজ্ঞান

১.২ রাজনীতিবিজ্ঞান–অনুশীলনে অনুসৃত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

১.২.১ বিভিন্ন সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি

(ক) দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি

(খ) অভিজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

(গ) ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি

(ঘ) আইনানুগ দৃষ্টিভঙ্গি

(ঙ) তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

১.২.২ বিভিন্ন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

(ক) মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি

(খ) আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

(গ) নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

(ঘ) বাস্তু-পরিবেশ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

১.৩ অনুশীলনী

১.৪ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

ব্যক্তি, সমাজ ও উভয়ের সম্পর্ককে জানার জন্য ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে। রাজনীতিবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানেরই একটি শাখা। ইউরোপে প্রাচীন গ্রীসে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতকে রাজনীতি চর্চার নজির পাওয়া যায়। ভারতেও পঞ্চম শতকে রাজনীতিচর্চার নিদর্শন রয়েছে তৎকালীন ধর্মগ্রন্থ, নীতিশাস্ত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে। পরবর্তী প্রায় কয়েক হাজার বছর ধরে রাজনীতিচর্চা সমাজবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্যও সমাজবিজ্ঞানের এই শাখাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন ধরনের বিষয়কে রাজনীতিচর্চার আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করায় রাজনীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। রাজনীতি আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও রাজনীতিবিজ্ঞানীগণ একমত পোষণ করেন না। একক 'ক' -এর উদ্দেশ্য হ'ল রাজনীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞাপ্রদানের বিষয়টি আলোচনা করা। পরবর্তী পর্যায়ে রাজনীতিবিজ্ঞান-অনুশীলনের যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পন্ডিতগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গিকে বাছাই করে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে সাধারণত সাবেকি এবং আধুনিক—এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, যদিও এ ধরনের বিভাজন আদৌ যুক্তিসঙ্গত কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। সাম্প্রতিককালে নারীবাদী আন্দোলন ও বস্তু-পরিবেশবাদী (Ecological) আন্দোলন রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং রাজনীতির বিশ্লেষণে নুতন মাত্রা যোগ করেছে। আমাদের আলোচনার এই দু'টি দৃষ্টিথভঙ্গি সম্পর্কেও আলোকপাত করা হবে। এই এককটি পঠন-পাঠনের মধ্যে দিয়ে আমরা যে বিষয়গুলো জানতে পারব তা হ'ল —

- রাজনীতিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর ভিন্নতার সংজ্ঞাপ্রদানে বহুমাত্রিকতা
- রাজনীতিবিজ্ঞানের অনুশীলনে অনুসৃত বিভিন্ন সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি, যেমন—দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, আইনানুগ দৃষ্টিভঙ্গি এবং তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি।
- রাজনীতিবিজ্ঞানের অনুশীলনে অনুসৃত বিভিন্ন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, যেমন—মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তু-পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

আমরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও ভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত—হয় সরাসরি নতুবা পরোক্ষভাবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই আবার রাজনীতি থেকে দূরে থাকি বা রাজনীতি-নিরপেক্ষ বলে দাবি করি। এসব ক্ষেত্রে হয় আমরা রাজনীতির প্রতি অনীহাবশত নিরপেক্ষ থাকি অথবা নিরপেক্ষতার আড়ালে একধরনের সুযোগসন্ধানী রাজনীতির আশ্রয় নিই। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—রাজনীতি ব্যাপারটা কি? রাজনীতি বলতে কি বোঝায়?-তাহ'লে দেখা যাবে এই প্রশ্নের উত্তরদানে প্রত্যেকেই হয় ইতস্তত করছেন নতুবা উত্তরে যা বলছেন তা বিভিন্ন রকমের। কেউ হয়ত বললেন, রাজনীতি হ'ল কীভাবে দেশ পরিচালনার জন্য ক্ষমতাদখল করা যায় এবং ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় তার কৌশল বা কার্যকলাপ ; অনেকে হয়ত বলবেন, রাজনীতি আসলে কিছু পাবার জন্য এক ধরনের ব্যবস্থা ; আবার কেউ হয়ত মন্তব্য করবেন, আজকের রাজনীতি এতই সর্বগ্রাসী

যে সমাজের সর্বত্র—ক্লাবে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, মাঠে-ময়দানে, স্কুল-কলেজে, চাকুরিপ্রার্থী বাছাইকরণে এমনকি পরিবারের মধ্যেও রাজনীতি ঢুকে পড়েছে। হয়তো এও শোনা যাবে, রাজনীতি একটা নোংরা ব্যাপার বা কাজ যার সঙ্গে মিথ্যা, কপটতা, লোভ, স্বার্থপরতা এমনকি হিংসাও জড়িত ; এর থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো। উনবিংশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হেনরি এডামস রাজনীতিকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের এক সুশৃঙ্খল কাঠামো বলে অভিহিত করেছিলেন অথচ প্রাচীন গ্রীসের অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের বহু তাত্ত্বিকই রাজনীতিকে অন্যতম মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে অভিহিত করেন।

১.১.১ রাজনীতিবিজ্ঞান হ'ল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিজ্ঞান

প্রাচীন গ্রীসে খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ-চতুর্থ শতকে এথেন্স, স্পার্টার ন্যায় বহু জনপদ ছিল। এই সমস্ত জনপদগুলোকে বলা হ'ত Polis যা বর্তমানে নগরের আয়তন বা ক্ষদ্রায়তন বিশিষ্ট হওয়ায় নগর-রাষ্ট্র (ciy-state) নামে অভিহিত করা হয় (যদিও নগর-রাষ্ট্রের পরিবর্তে জনপদ বা পুরসমাজ বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত)। এই সমস্ত জনপদগুলোর শাসনকার্য পরিচালনার ধরনও ছিল বিভিন্ন রকমের—রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, বণিকতন্ত্র, সাধারাণতন্ত্র প্রভৃতি। এই সমস্ত Polis বা তথাকথিত নগর-রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে Politics, বা রাজনীতিবিজ্ঞান হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তৎকালীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল এই অর্থেই তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেন Politics। রাজনীতির প্রাচীনতম সংজ্ঞাটি এই উদ্ভবগত দিকটিকেই চিহ্নিত করে—'রাজনীতিবিজ্ঞান হল রাজনীতি তথা রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান'।

রাজনীতিশাস্ত্রের এই সংজ্ঞাটি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিচর্চার অন্যতম সংজ্ঞা হিসেবে চলে আসছে। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের প্রথম দিকে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রাধান্যের সময়ে রাজনীতিবিজ্ঞানীগণ এই প্রাচীনতম সংজ্ঞাটিই গ্রহণ করেন। উদাহরণ হিসেবে গার্ণার (Garner)–এর দেওয়া সংজ্ঞাটির উল্লেখ করা যেতে পারে-'সংক্ষেপে বলা যায়, রাজনীতিবিজ্ঞানের শুরু ও শেষ রাষ্ট্রকে নিয়ে।' গার্ণার-এই সংজ্ঞাকেই আরো সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন গেটেল (Gettel)। গেটেল যে সংজ্ঞা দেন তাহল, 'রাষ্ট্র কি ছিল, কি হয়েছে আর ভবিষ্যতে কিরূপ হওয়া উচিত তারই নীতিভিত্তিক অনুসন্ধান ও চর্চার নাম রাজনীতিবিজ্ঞান'। গিলক্রাইস্ট (Gilchrist) –এর মতে, 'রাজনীতিবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও সরকারের আলোচনা করে'। পল জানে (Paul Janet) –এর মতে, রাজনীতিবিজ্ঞান হ'ল সমাজবিজ্ঞানের সেই শাখা যা রাষ্ট্রের ভিত্তি, সরকারের নীতি ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে।' পোলক (Pollock) এবং জেলিনেক (Jellinek) রাজনীতিবিজ্ঞানকে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত করে বলেন, 'তত্ত্বগতভাবে রাজনীতিবিজ্ঞান রাষ্ট্রের উদ্ভব, প্রকৃতি, ব্যপ্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক, স্বাধীনতা প্রভৃতি আলোচনা করে আর ব্যবহারিক দিক থেকে রাজনীতিবিজ্ঞান হ'ল সরকার, সংবিধান, আইনপ্রণয়ন, বিচার কূটনীতি প্রভৃতি আলোচনা সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

রাজনীতিবিজ্ঞানের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সাবেকি সংজ্ঞার পরিমার্জিত আধুনিকরূপ দেখা যায় ডেভিড ইস্টন (David Easton) -এর রচনায়, যদিও ইস্টন রাজনীতির আলোচনায় ব্যপ্তি আচরণকেই গুরুত্ব দেন। ইস্টন (১৯৫৩/১৯৬৫) রাজনীতিতে মানের কর্তৃত্বমূলক বন্টন, (authoritative allocation of values) বলে অভিহিত করেন। আপাতদৃষ্টিতে ইস্টনের সংজ্ঞায় রাষ্ট্রের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও কর্তৃত্বমুলক বন্টন যে রাষ্ট্রর মাধ্যমেই একমাত্র সম্পাদিত হয় তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

সীমাবদ্ধতা : সাম্প্রতিকালে হেউড (Haywood) রাজনীতিবিজ্ঞানের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সংজ্ঞার কতগুলি সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করেন। প্রথমত, রাজনীতিকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ / সংগঠনের মধ্যে আবদ্ধ রাখার অর্থ হ'ল রাজনীতির পরিধিকে সংকুচিত করা; রাজনীতি যেন শুধুমাত্র আইনসভা, মন্ত্রিমন্ডলী, বিভিন্ন সরকারী বিভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং রাজনীতিবিদ ও সরকারী কর্মচারীদের এক্তিয়ারভুক্ত। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন, ব্যবসায়ী সংস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী, পরিবার রাজনীতির উর্ধ্বে। তাছাড়া রাজনীতিকে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর মধ্যে আবদ্ধ রাখলে বর্তমানে বহুজাতিক সংস্থাগুলি বা প্রচারমাধ্যম, আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বিধিনিষেধ ব্যক্তিজীবনকে যে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে তাকে অস্বীকার করতে হয়। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জনপ্রতিনিধিমূলক শানব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও প্রসার অবশ্যম্ভাবী। এমতাবস্থায় রাজনীতিকে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক করার অর্থই হ'ল রাজনীতি ও দলীয় রাজনীতিকে সমার্থক হিসেবে দেখা। এর ফলে দলীয় ব্যবস্থার কুফলগুলি রাজনীতির কুফল হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। স্বার্থপরতা, শঠতা, উৎকোচগ্রহণ, ঘৃণা, দুর্নীতি, হিংসা—সমস্তই যেন রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। প্রত্যাশা করা হয় সরকারী কর্মচারী এবং বিশেষ করে বিচারকগণ রাজনীতিনিরপেক্ষ থাকবেন। সম্ভবত এই ধারণার বশবর্তী হয়েই সাম্প্রতিককালে তথাকথিত অরাজনৈতিক সংগঠনগুলির উপর গুরুত্ব আরোপের পৌরসমাজ (civil society—অর্থের রূপান্তর ঘটিয়ে অরাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করে) গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। রাজনীতি থেকে বিমুখ হয়ে বা সরে দাঁড়িয়ে সুস্থ সমাজ গঠনের সম্ভাবনা তাই অলীকই রয়ে গেছে।

১.১.২ রাজনীতিবিজ্ঞান সর্বজনিক বিষয়ের বিজ্ঞান

রাজনীতিবিজ্ঞানী অ্যারিস্টটল, জন লক, হেগেল, জন স্টুর্য়ার্ট মিল সাম্প্রতিককালে আরেন্ট (Arendt) রাজনীতিকে সর্বজনিক বিষয় বা সরকারী বিষয় (Public) বলেও উল্লেখ করেন। অর্থাৎ রাজনীতি (politics) এবং সর্বজনিক বিষয় (Public) সমার্থক। অন্যভাবে বলা যায় রাজনীতি ও অরাজনীতির মধ্যে পার্থক্য হল সর্বজনিক (public) এবং ব্যক্তিগত (private) বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য। সাধারণত Public –এর বাংলা সরকারী করা হয় কিন্তু সঠিক অর্থ হল সর্বজনীন যা সরকারী এবং বেসরকারী (যেমন পাবলিক লাইব্রেরী, পাবলিক হল) হতে পারে। হেউড (Haywood)–এর মতে, রাজনীতিকে এভাবে সংজ্ঞায়নের নজির পাওয়া যায় অ্যারিস্টটলের Politics গ্রন্থে যেখানে অ্যারিস্টটল মানুষকে রাজনৈতিক জীব বলে উল্লেখ করেন। একমাত্র রাজনৈতিক সমাজেই মানুষের সুন্দর জীবন সম্ভব। এ কারণেই অ্যাসিস্টটল রাজনীতিকে প্রধান বিজ্ঞান (Master Science) বলে উল্লেখ করেন।

কিন্তু সমস্যা হ'ল সার্বজনীন ক্ষেত্র এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্র—এই দুই এর মধ্যে সীমারেখা টানা কি সম্ভবপর? সাধারণত সর্বজনিক বা সরকারী (যদিও উভয় শব্দ সমার্থক নয়) বলতে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সংগঠন/সংস্থা, রাষ্ট্রাধীন সংস্থাসমূহকে বোঝায় এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্র বলতে পুরসমাজকে বোঝায় যেমন পরিবার, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যা ব্যক্তিদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় স্বীয় গোষ্ঠস্বার্থ সাধনের জন্য গড়ে ওঠে ও পরিচালিত হয়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে পরিচালনা ও ব্যয়ভারের দায়িত্ব থাকে রাষ্ট্রের হাতে। টমাস হবস্ (Thomas Hobbes) এর রচনায় অবশ্য এ ধরনের বিভাজন নেই। কিন্তু জন লক্ (John Lock) এবং বিশেষ করে হেগেলের (Hegel) রচনায় রাষ্ট্র ও পুরসমাজের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। হেগেলকে অনুসরণ করে পরবর্তী

তাত্ত্বিকগণও পুরসমাজকে রাষ্ট্র বিকাশের পূর্ববর্তী স্তর হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

কিন্তু আর এক দল তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে আরো সংক্ষিপ্তকরণে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সম্প্রসারণে পক্ষপাতী। উপরোক্ত বিশ্লেষণে পুরসমাজের বিভিন্ন সংস্থাসমূহ যেমন ব্যবসায়ী সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্লাব গোষ্ঠী সংস্থাসমূহ কমবেশী সর্বজনিক ও রাজনীতিসম্পৃক্ত। এ কারণে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্র যেমন পরিবার, জাতিগোষ্ঠী, ব্যক্তি সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধকরণের চেষ্টা করা হয়। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)–এর একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্র (self-regarding aspect) এবং যা অপরকে স্পর্শ করে এমন ক্ষেত্র (other regareding aspect) মধ্যে পৃথকীরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

হেউড (Haywood)–এর মতে রাজনীতিকে সর্বজনিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত করায় রাজনীতি সম্পর্কে কতকগুলি ইতিবাচক ও নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। অ্যারিস্টটল-এর ঐতিহ্য অনুসারী বিশ্লেষণে রাজনীতিকে সর্বজনিক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং রাজনীতিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক নৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলে গণ্য করা হয়েছে। আধুনিক যুগে Arendt ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত The Human Condition গ্রন্থে রাজনীতিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মানবিক কাজ বলে উল্লেখ করেন। জন স্টুয়ার্ট মিলও গণতন্ত্রে সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধিতে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেন। রুশো (Russeau) তো রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তরকরণেরই বিরোধী ছিলেন। অপরদিকে আর এক দল তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা রাজনীতির নেতিবাচক দিকের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে থেকে ব্যক্তিকে যতদূর সরিয়ে রাখা যায় ততই নিরাপদ মনে করেন। একমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই ব্যক্তির পক্ষে বাছাইকরণ, স্বাধীনতা ও দায়িত্বের প্রশ্নগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। যে রাষ্ট্র যত কম কাজ করেন। সেই রাষ্ট্র তত ভালো—এই বক্তব্যের মধ্যেই উপরোক্ত ধারণা স্পষ্ট। সাধারণত উদারনীতিবাদীতত্ত্বে এবং সাম্প্রতিককালে এই শতকের নয়ের দশকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়ের পরে, গ্লসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকার যুগে এই প্রবণতা নূতন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

সর্বজনিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের মধ্যে পৃথিকীকরণ এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে সর্বজনিক তথা রাজনীতি থেকে বিমুক্ত করার বিরুদ্ধে মতও লক্ষ্য করা যায়। জন স্টুয়ার্ট মিল বর্ণিত একান্ত ব্যক্তিগত (self–regarding) ক্ষেত্র এবং 'অন্য বিষয়' (other regarding) ক্ষেত্রের মধ্যে ভেদরেখা টানা অসম্ভব। সাম্প্রতিক নারীবাদী আন্দোলনে (Feminist movement) এই বিভাজন সম্পর্কে আপত্তি তোলা হয়েছে। পরিবারকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অর্থই হ'ল নারীকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। পরিবার, নারীবাদীদের মতে, রাষ্ট্রেরই সংক্ষিপ্ত রূপ যেখানে রাষ্ট্রের মতই পরিবারে বিভাজন, শোষণ, বঞ্চনা রয়েছে। এযাবৎকাল বিদ্যমান সমাজের ইতিহাস হ'ল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস—পুরুষ ও নারীর মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস—কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর বহুল প্রচলিত প্রারম্ভিক বক্তব্যটিকে সামান্য পরিবর্তন করে উপস্থাপন করা হয়। নারীবাদীদের মতে, পরিবার ও রাজনীতির অত্যুক্তি—একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্র হিসেবে পরিবারকে সরিয়ে রাখা শুধমাত্র নিরর্থকই নয়—উদ্দেশ্যপ্রণোদিতও।

একইভাবে বলা যায়, ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ধর্মনিপেক্ষতার যে বক্তব্য পেশ করা হয় তা অসঙ্গতিপূর্ণ। মানবিক চেতনা/মূল্যবোধের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ যে কোন ধর্মীয় আচরণই রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বহুধর্ম-অধ্যুষিত রাষ্ট্রের একমাত্র রাষ্ট্রই যেহেতু সর্বজনিক সংস্থা সেহেতু রাষ্ট্রে এক্তিয়ার

থাকা উচিত সকল সংস্থাগুলো এমনকি ধর্মীয় সংস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ করার। সাম্প্রতিককালে স্বল্পক্ষমতাসম্পন্ন (minimal state) এর প্রবক্তাগণ অবশ্য সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রকে সীমিতকরণ করে পৌরসমাজ /স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর ক্রমবর্ধমান প্রসারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

কোন রাজনৈতিক ঘটনা, সমস্যা বা বিষয় বিশ্লেষণে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হতে দেখা যায়। এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনায় রাজনীতিবিজ্ঞানীগণ যে সমস্ত তালিকা পেশ করেছেন তা যেমন সম্পূর্ণ নয়, এই সমস্ত তালিকার বিষয়সূচিও সমরূপ নয়। যেমন, রাজনীতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে সাধারণত মূল্যমানসাপেক্ষ (Normative) এবং অভিজ্ঞতামূলক (Empirical) এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। এ্যালান বল (Alan Ball) দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে সাবেকি এবং আধুনিক—এই দুইভাগে ভাগ করেছেন। সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দার্শনিক (Philosophical), ঐতিহাসিক (Historical) এবং আইনানুগ (Juristic/Legalistic) এই তিনভাগে ভাগ করেন। হেউড রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সাবেকি এবং বৈজ্ঞানিক এই দুইভাগে ভাগ করে সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দার্শনিক (যা মূল্যমানসাপেক্ষ) এবং অভিজ্ঞতামূলক এই দুইভাগে ভাগ করেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনায় অন্যান্য তাত্ত্বিকগণ যেখানে শুরু করেন আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হেউড সেখানে কার্ল মার্কসকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম তাত্ত্বিক বলে অভিহিত করে পরবর্তী পর্যায়ে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করেন। ভ্যান ডাইক ১৯৬০ সালে প্রকাশিত তাঁর Political Science : A Philosophical Analysis গ্রন্থে রাজনীতি বিশ্লেষণের অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গির এক বিশাল তালিকা পেশ করেন। যেখানে চারটি ভাগে মোট বাইশটি দৃষ্টিভঙ্গি স্থান পেয়েছে। এই বিস্তারিত তালিকার বিশ্লেষণে না গিয়ে আমরা রাজনীতি বিশ্লেষণে বহুল ব্যবহৃত যে শ্রেণীবিভাগ যথা সাবেকি এবং আধুনিক—এই দুই ভাগে বিভক্তকরণের মধ্য দিয়ে আলোচনা করব।

১.২.১ বিভিন্ন সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি

প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন, সাবেকি এবং আধুনিক শব্দ দু'টি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত শব্দ (loaded term)। রাজনীতিচর্চার এই বিভাজন করা শুধুমাত্র অসম্ভবই নয়, অবৈজ্ঞানিক এবং কষ্টকল্পিত। সাধারণত, আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক শব্দ দু'টিকে সমার্থক হিসেবে গণ্য করা হয়। রাজনীতিচর্চার ইতিহাসে ম্যাকিয়াভেলিকে (Machavelli) আধুনিক রাজনীতিচর্চার পুরোধা বলা হয় অথবা রাজনীতি বিশ্লেষণে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনাপর্ব হিসেবে ১৯০৮ সালে প্রকাশিত গ্রাহাম ওয়ালেস (Graham Wallas)-এক Human Nature in Politics এবং আর্থার বেন্টলের (Arthur Bentlay) 'The Process of Government' গ্রন্থ দুটিকে ধরা হয়। অনেক সময় আবার ১৯২৫ সালে প্রকাশিত মেরিয়ামের New Aspects of Politics গ্রন্থটিকে এবং পরবর্তী দুই দশকে ল্যাসওয়েলের Politics : Who gets, What, When, How, ডেভিড ট্রুম্যানের (David Truman) The Governmental Process এবং ইস্টনের The Political System অনুসৃত

দৃষ্টিভঙ্গিকে রাজনীতিচর্চার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

দৃষ্টিভঙ্গির শ্রেণীবিভাজনের উপরোক্ত সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেও আমরা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সাবেকি এবং আধুনিক—এই দুইভাগে বিভক্তকরণের মাধ্যমে আলোচনা করব। সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি আলোচিত হবে তা হ'ল—(ক) দার্শনিক (Philosophical) (খ) অভিজ্ঞতামূলক (Empirical) (গ) ঐতিহাসিক (Historical) (ঘ) আইনানুগ (Legalistic/Juridical) এবং (ঙ) তুলনামূলক (Comparative) দৃষ্টিভঙ্গি।

(ক) দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি

হেউড দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকে সমার্থক হিসেবে গণ্য করেন। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে রাজনীতিচর্চার সূচনাপর্ব থেকেই গ্রীসে প্লেটোর রচনায়। বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রে সম্পর্ক রাষ্ট্রকে মান্য করার কারণ বা ব্যক্তির অধিকারে সীমারেখা কী হওয়া উচিত—এই ধরনের প্রশ্নগুলিই প্রধান বলে বিবেচিত হয়। নৈতিক (Ethical), নির্দেশক (Prescriptive), মূল্যসাপেক্ষ (value – oriented), উদ্দেশ্যমূলক (Teleological)-প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। মধ্যযুগে সেন্ট অগাস্টিন (Augustine), সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাস (St, Thomas Acquians), পরবর্তীকালে বেন্থাম, হেগেল, টি. এইচ. গ্রীন প্রমুখ দার্শনিকগণ রাজনীতিচর্চার এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন। রাজনীতিবিজ্ঞান যেহেতু উদ্দেশ্যমূলক বিজ্ঞান-শুধুমাত্র বর্তমান সমাজবিশ্লেষণে নয়, নূতন সমাজ গড়ে তোলারও বিজ্ঞান—তাই রাজনীতি বিশ্লেষণে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব অসীম। সাম্প্রতিক কালে, বিশেষত আচরণবাদোত্তর পর্বে রাজনীতি বিশেষজ্ঞগণ পুনরায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা মূল্যসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকে রাজনীতিচর্চায় অনুসরণ করছেন।

(খ) অভিজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

অভিজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনাপর্বে প্রাচীন গ্রীসে এবং অ্যারিস্টটলের রচনায়। তৎকালীন গ্রীসের ১৫৮ টি (তথাকথিত নগর-রাষ্ট্রের) জনপদের প্রকৃতি অনুধাবন ও বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে অ্যারিস্টটল রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করেন। পরবর্তীকালে ম্যাকিয়াভেলি, মন্তেস্কু-এর রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হয়। লক এবং ডেভিড হিউম-এর রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান বলে বিবেচিত হয় এবং ঊনবিংশ শতকে অগাষ্ট কোঁৎ (Auguste Connte)–এর রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ণতা লাভ করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে জ্ঞানের একমাত্র উৎস হ'ল অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে। সুতরাং, যে কোন তত্ত্ব বা প্রকল্প (Hypothesis) গড়ে তোলা এবং পরীক্ষিত হওয়া উচিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। এ কারণে বাস্তবে অবিকল উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেহেতু জ্ঞানার্জন ঘটে পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেহেতু অভিজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাগণ রাজনীতিবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রকৃতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করতে বলেন। বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা যায়, এই দৃষ্টিভঙ্গি—(১) পর্যবেক্ষণ তথা অভিজ্ঞতামূলক (২) বর্ণনাত্মক (২) মূল্যমান নিরপেক্ষ (৪) বিষয়গত (objective) । এই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব আধুনিককালেও হ্রাস পায়নি। একদিকে যেমন এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সোপান হিসেবে কাজ করেছে অপরদিকে প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক এবং তুলনামূলক রাজনীতির

বিশ্লেষণে ভিত্তিমূলক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

(গ) ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল বর্তমানের কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সমস্যা, ধারণার বিশ্লেষণে তার পূর্বতন অবস্থা, প্রকৃতি কিরূপ ছিল, কিভাবে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হ'ল তার ব্যাখ্যা করা। এক কথায় অতীতের প্রেক্ষাপটে বর্তমানকে বিশ্লেষণ এবং বর্তমানের আলোকে ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা। এর জন্য প্রয়োজন প্রাপ্ত প্রমাণ ও তথ্যাদির ভিত্তিতে অতীতের বিশ্লেষণ। অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রে উদ্ভবের কারণ অন্বেষণ করেছেন জৈবিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের তথা স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পরিবারের মধ্যে। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনে এক স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান। রোমান দার্শনিক সিসেরো (Cicero), জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hegel), কার্ল মার্কস (Karl Marx) ঐতিহাসিক সাহায্যেই রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। আইভর জেনিংস (Ivor Jennings). রবার্ট ম্যাকেঞ্জিও (Robert Mackenzie) ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ব্রিটিশ সংবিধানকে ব্যাখ্যা করেছেন। সাম্প্রতিককালে রাজনীতিবিজ্ঞানী মাইকেল ওকসট (Michael Oakeshot) রাজনীতির বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বের কথা বলেন।

অবশ্য অধিকাংশ সময়েই অতীতকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রকৃত তথ্যের অভাব বা অপূর্ণতা অনুমাননির্ভর ইতিহাস (Conjectural History) গড়ে তোলে। এর ফলে বিভিন্ন পর্বে ইতিহাসের বিনির্মান ঘটতে থাকে। তাছাড়া, ইতিহাস রচনায় কোন একটি বিশেষ দিক যেমন রাজনৈতিক বা সামরিক দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় অথবা আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটকে বাদ দিয়ে রাজনীতির স্বরূপ উদঘাটন সম্ভবপর নয়। সর্বোপরি, ইতিহাস শুধুমাত্র ধারাবাহিক ঘটনার বিবরণমাত্র নয়। অনুসন্ধানী তথা ঐতিহাসিকের প্রবণতা ইতিহাস বিশ্লেষণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। হেগেল, কার্ল মার্কস-উভয়েই রাষ্ট্রে উদ্ভবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুমান করছেন কিন্তু একজন রাষ্ট্রকে দেখেছেন ভাব / সত্ত্বার চরম প্রকাশ হিসেবে ; অন্যজন শ্রেণীশোষণের যন্ত্র বা সংগঠিত ক্ষমতার প্রকাশ হিসেবে।

(ঘ) আইনানুগ দৃষ্টিভঙ্গি

আইনানুগ দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বোঝায় আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের বিচার-বিশ্লেষণ। সাংবাদিক ও সাধারণ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংস্থা, সরকারী বিভাগসমূহের গঠন, ক্ষমতা, কার্যাবলী ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণই এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান লক্ষণ। এ কারণে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (Institutional Apporach) এবং বর্ণনাত্মক ও অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সংগত বলে মনে করা হয়। অ্যারিস্টটলের পলিটি (Polity) বিশ্লেষণে যেমন এর নজির পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে ডাইসির (A.V. Dicey) বিশ্লেষণে এই দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসৃত হয়েছে। দুর্গাদাস বসু (Durga Das Basu) –র ভারতীয় সংবিধান বিশ্লেষণেও এই দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট।

আইনানুগ দৃষ্টিভঙ্গি এক ধরনের সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। আইনানুগ কাঠামোর বাইরে যে সমস্ত সংস্থা বা গোষ্ঠী, যেমন রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, নৃজাতি গোষ্ঠী (Ethnic group) রয়েছে যা রাজনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে তা এই বিশ্লেষণে গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয় না। তাছাড়া, কোন রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠার পিছনে যে আর্থ—সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক শক্তিগুলি ক্রিয়াশীল থাকে তাও এই বিশ্লেষণে

স্থান পায় না।

(ঙ) তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

রাজনীতির বিশ্লেষণে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ। ওই দৃষ্টিভঙ্গিকে সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির তালিকায় রাখা কতদূর যুক্তিযুক্ত সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রাচীন গ্রীসে অ্যারিস্টটলের রাজনীতিচর্চার মূলে ছিল এই দৃষ্টিভঙ্গি। আবার, এই শতকের ষাটের দশকে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক রাজনীতি বিশ্লেষণের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পায়। জি. এ. আলমন্ড (G. A. Almond), লুসিয়েন পাই (Lucian Pye). প্রমুখের রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক ছাপ ফেলে। সুতরাং তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে সাবেকি এবং আধুনিক—এই দুই ধারাতেই রাখা যেতে পারে।

তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সাবেকিকরণ লক্ষ্য করা যায় অ্যারিস্টটলের রচনায়। অ্যারিস্টটল বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনার জন্য দু'টি মানদণ্ড বেছে নেন—এখন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং দুই শাসকের সংখ্যা। তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে ছয়টি ভাগে ভাগ করেন এবং পলিটি (Polity)-র সর্বাপেক্ষা কাম্য শাসনব্যবস্থা বলে মনে করেন। মন্তেস্কুও ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর রাষ্ট্রদর্শন গড়ে তোলেন। লর্ড ব্রাইস, স্ট্রং, ডাইসি প্রমুখ সংবিধান বিশারদগণও সংবিধানের শ্রেণীবিভাজনের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন। তুলনামূলক বিশ্লেষণের সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনাত্মক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাষ্ট্রকেন্দ্রিক কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনীতির বিশ্লেষণে, বিশেষত ষাটের দশকে মার্কিন-রাজনীতিবিজ্ঞানীদের রচনায় তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এক নূতন মাত্রা পায়। রাজনীতি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ শুরু হওয়ায় অপ্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠীগুলির (যেমন রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারীগোষ্ঠী, পরিবার, নৃজাতিগোষ্ঠী) বিশ্লেষণ তুলনামূলক আলোচনায় গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হ'তে থাকে। তাছাড়া, রাষ্ট্র ও সরকারের পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থা আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতিও তুলনামূলকভাবে আলোচিত হ'তে থাকে। এই বিশ্লেষণে অনেক ক্ষেত্রেই উন্নয়নের মাত্রা, আধুনিকতা, শিল্পায়ন, রাজনৈতিক সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হ'তে থাকে। অবশ্য এই বিশ্লেষণের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেহেতু আধুনিকীকরণ (পশ্চিমী গণতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রে অনুসরণ) ও পশ্চিমী রাজনৈতিক ধারণাসমূহ প্রধান মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয় সেহেতু তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি বিশ্লেষণে উক্ত মানদণ্ডের ব্যবহার কতদূর যুক্তসংগত সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

১.২.২ বিভিন্ন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকেই রাজনীতি বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ বিশেষত জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার পদ্ধতি ও সূত্রসমূহ ব্যবহৃত হ'তে থাকে। একদিকে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব অপরদিকে সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে নূতনতর রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা রাজনীতিবিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগে অনুপ্রাণিত করে। সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক, প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যসাপেক্ষ, দার্শনিক বিশ্লেষণের পরিবর্তে পর্যবেক্ষণ, তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনীতির বিশ্লেষণ এবং সমাজসমস্যার সমাধানের তত্ত্বসমূহকে কাজে লাগানোর প্রবণতা দেখা যায়। ঊনবিংশ শতকের ত্রিশের দশকে অগাষ্ট কোঁৎ-এর সমাজবিশ্লেষণ শেষের ডুর্কহাইম (Durkheim) Rules of Sociological Method -এর প্রকাশ এই

প্রবণতারই প্রমাণ। অপরদিকে, কার্ল মার্কস সাবেকি রাজনীতিচর্চার দৈন্যতাকে তুলে ধরেন এবং সামগ্রিকতার প্রেক্ষাপটেই রাজনীতির বিশ্লেষণে এবং সমাজ পরিবর্তনের মূলসূত্রগুলি চিহ্নিতকরণে অগ্রসর হন। সমাজকে শুধমাত্র বিশ্লেষণই নয়—এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তিকে চিহ্নিতকরণ ও তৎসহ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দেন। এদিক থেকে কার্ল মার্কসকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির মাধ্যমে রাজনীতি বিশ্লেষণের প্রথম তাত্ত্বিক বলা যায়।

বিংশ শতকের প্রথম থেকেই রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশ্লেষণের পরিবর্তে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচরণকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ শুরু হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এই প্রবণতা এক বৌদ্ধিক আন্দোলনের রূপ নেয়। এই আন্দোলনেকে রাজনীতিচর্চার ইতিহাসে আচরণবাদী বিপ্লব নামে অভিহিত করা হয়। ১৯৬০-এর দশকে রাজনীতিচর্চার অনুসৃত সব দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ শোনা যায় নারীবাদী আন্দোলনের এবং পরিবেশবাদী তাত্ত্বিকদের রচনায়। নারীবাদীতাত্ত্বিকদের বক্তব্য হ'ল এযাবৎকাল রাজনীতিটা পুরোমাত্রায় পুরুষতান্ত্রিক এবং এ কারণে নারীদের যোগ্য অবস্থানের বিষয়টি অনুচ্চারিত এবং অবহেলিত থেকে গেছে। পরিবেশবাদীগণ রাজনীতিচর্চায় দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের তথা যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলে সমালোচনা করেন এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিকবাদের পরিবর্তে গোটা বিশ্ব-পরিবেশের প্রেক্ষাপটে, জীবজগৎ-এর বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ ও পদার্থসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে রাজনীতির বিশ্লেষণ করেন। এভাবে ১৯৭০-এর দশকে পরিবেশ-পরিমণ্ডল শুধমাত্র জীববিদ্যা বা পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত না থেকে রাজনীতিচর্চার অন্যতম মতাদর্শ হিসেবে স্থান করে নেয়। আমাদের এই প্রবণতাগুলিকে বিবৃত করার চেষ্টা হয়েছে। আধুনিক রাজনীতিচর্চার দৃষ্টিভঙ্গির তালিকায় যে-সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে তা হ'ল—(১) মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি (২) আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (৩) নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (৪) বস্তু-পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

(ক) মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে হেউড রাজনীতিচর্চার প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে অভিহিত করেন। মিলিব্যান্ড (Miliband) *Marxism And Politics* গ্রন্থের ভূমিকায় রাজনীতি সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনার কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করেন। প্রথম সমস্যা হ'ল মার্কসবাদ শব্দটি নিয়ে। মার্কসবাদ শব্দটি কার্ল মার্কস-এর মৃত্যুর পর ব্যবহৃত হয়েছে কার্ল মার্কস এবং তার সহযোগী বন্ধু ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর অনুসৃত তত্ত্ব আলোচনায়। পরবর্তীকালে এই মতবাদ আলোচিত, অনুসৃত এবং সমৃদ্ধ হয়েছে বহু তাত্ত্বিক / রাজনীতিবিদদের দ্বারা, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লেনিন, রোজা লুক্সেমবুর্ক, গ্রামসি এবং ট্রটস্কি প্রমুখ যাদের মিলিব্যান্ড ধ্রুপদী মার্কসবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনে মার্কসবাদের প্রয়োগিক দিকগুলির উপর বিশেষ যত্নশীল হন যথাক্রমে স্তালিন এবং মাও-জে-দঙ। বিংশ শতকের বিশের দশকের পরবর্তী পর্যায়ে একদিকে যেমন সোভিয়েত রাশিয়ার মার্কসবাদের মূলসূত্রগুলিকে চিহ্নিতকরণের প্রয়াস শুরু হয় এবং মার্কস-এঙ্গোলস-লেনিনবাদের প্রবক্তা (বাছাই করা) বিরোধী বক্তব্য সংশোধনবাদী প্রতিক্রিয়াশীল বলে বাতিল করা হয়; অপরদিকে প্রায় প্রত্যেক তাত্ত্বিকই নিজস্ব ধাঁচে মার্কস এবং এঙ্গোলস -এর রচনাকে ব্যবহার করে মার্কসবাদ -এর বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি করেন। আমাদের আলোচনা মার্কস এবং এঙ্গোলস -এর বক্তব্যের মধ্যে মূলত সীমাবদ্ধ থাকবে।

মার্কস এবং এঙ্গেলস -এর বক্তব্যকে নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়ে মার্কসবাদের বিভিন্ন ধারার সৃষ্টির অন্যতম কারণ হ'ল রাজনীতি সম্পর্কে কার্ল মার্কস -এর কোন সুনির্দিষ্ট, সুবিন্যস্ত তত্ত্বের অভাব। কার্ল মার্কস -এর অধিকাংশ রচনাই, যেমন The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (১৮৫২), The Civil war in France (১৮৭১), Communist Manifesto (১৮৪৮), Critique of the Gotha Programme (১৮৭৫) কোন বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আশু ঘটনার চাপে লিখিত। এই ঐতিহাসিক পটভূমি বাদ দিয়ে কার্ল মার্কস-এর বক্তব্য ব্যবহার করায় বিভিন্ন মার্কসবাদের সম্ভাবনা থেকে যায়। তাছাড়া, মার্কস সাধারণভাবে কোন রাজনৈতিক তত্ত্ব রচনার পরিবর্তে সমাজবিকাশের ধরন, প্রকৃতি এবং মূলসূত্রগুলিকে চিহ্নিতকরণ করেছেন। রাজনীতি যেহেতু সমাজেরই—এর ব্যবস্থাপনা তাই সমাজবিশ্লেষণে রাজনীতির প্রসঙ্গটি বার বার এসেছে। ব্যক্তি তথা সমাজজীবনের এই সামগ্রিকতার প্রেক্ষাপটেই মার্কস রাজনীতির বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে রাজনীতি, দর্শন ইতিহাস সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতির মধ্যে কোন সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানা সম্ভবপর নয়। সর্বোপরি কার্ল মার্কস রাজনীতির বিশ্লেষণ করেছেন সমাজবিকাশের প্রেক্ষাপটে; বিদ্যমান সমাজকাঠামোর বিশ্লেষণের মধ্যেই তিনি এই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। সমাজরূপান্তরের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই রাজনীতি সম্পর্কে মার্কসীয় দর্শন শুধুমাত্র বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ-এর দর্শনমাত্র নয়—সমাজ পরিবর্তনেরও এক দর্শন।

কার্ল মার্কস রাজনীতিকে দেখেছেন ক্ষমতা বা প্রাধান্যের সমার্থক হিসেবে। রাজনীতি হ'ল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি শ্রেণী গোটা সমাজজীবনের উপর ক্ষমতা তথা প্রাধান্য বজায় রাখে। মার্কসীয় তত্ত্বে ক্ষমতার ধারণাটি যেহেতু শ্রেণী — ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, সেহেতু শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে রাজনীতির উদ্ভব। উদারনীতিবাদীতত্ত্বে এই মত পোষণ করা হয় যে, রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবহৃত বল প্রয়োগ যথাযথ ও বৈধ, কারণ রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে সমাজের সকলের অথবা অন্ততপক্ষে সংখ্যাধিক জনের জন্য গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। উদারনীতিবাদীদের এই ধারণাকে মার্কসীয় তত্ত্ব অসত্য বলে মনে করে প্রত্যাখ্যান করে এবং রাষ্ট্রকে শ্রেণীশোষণের যন্ত্র বলে মনে করে। মার্কসের মতে, আদিম সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সমাজস্বার্থের মধ্যে কোন সংঘাত ছিল না। ব্যক্তি কোন গোষ্ঠী দ্বারাই পরিচালিত হত এবং ঐ গোষ্ঠীতে তার অংশগ্রহণ ছিল প্রত্যক্ষ। ক্ষমতা বিচ্ছিন্নকরণ (Alienation) হয়নি। কিন্তু, ক্রমবিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে এবং এর ফলে ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সমাজস্বার্থের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। প্রয়োজন হয় এই স্বার্থের দ্বন্দ্বের মোকাবিলার এক বিচ্ছিন্ন ক্ষমতার (alienated power) বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার। রাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হ'ল ক্ষমতারই বাহন।

বস্তুত, মার্কসবাদ রাজনীতিকে সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যাখ্যা করেনি। এই মতবাদে সমাজজীবনকে একটি অখন্ড সমগ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সমাজজীবনের প্রকৃতি এবং পরিবর্তন ব্যাখ্যা সম্পর্কিত মার্কস -এর বক্তব্যকে মার্কস পরবর্তী মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণ বিশেষত এঙ্গেলস এবং প্লেখানভ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ শব্দটি ব্যবহার করেন। একে মার্কসবাদের মূল তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভিত্তি বলে গণ্য করা হয়। এই ভিত্তির ওপরেই গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক বিকাশ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তত্ত্ব যাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বলা হয়। মার্কসীয় রাজনীতির আলোচনায় তাই এ বিষয়ে জানা অত্যন্ত জরুরী।

মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, বস্তু, প্রকৃতি ও সত্তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে; আমাদের চৈতন্যের বাইরে স্বতন্ত্রভাবে এর অবস্থান। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্ব মনে করে যে, সব বস্তু বা ঘটনার প্রবাহের বৈশিষ্ট্য তার অন্তর্দ্বন্দ্বে যা বিরোধের মধ্যে দিয়ে উচ্চস্তরে বিকাশ লাভ করে। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এই বিকাশে প্রক্রিয়াকে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া বলে। সুতরাং, কোন বস্তু বা ঘটনাকে বুঝতে গেলে এর প্রকৃতি যে পরিবর্তনশীল তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই তত্ত্ব মনে করে যে, মানবজীবনের অস্তিত্বের জন্য প্রথম প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। মানুষ যা ভোগ করে তার সব কিছু অন্য প্রাণীর মত প্রকৃতি থেকে সরাসরি পাওয়া যায় না; যা তারা ভোগ করে তা তাদের উৎপাদন করতে হয়। উৎপাদন করতে গিয়ে তারা দৈহিক অথবা মানসিক শ্রমের মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে ভোগ্যবস্তুতে রূপান্তরিত করে। এই শ্রমপ্রক্রিয়ার মধ্যে যুক্ত রয়েছে (ক) উৎপাদনের উপকরণ, অর্থাৎ হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রম ছাড়া অন্য উপাদান এবং (খ) শ্রম, যেহেতু মানুষের শ্রম ছাড়া উৎপাদন হতে পারে না। একদিকে উৎপাদনের প্রয়োজনে মানুষের তৈরী যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ার-সহ সব বস্তু এবং অন্যদিকে মানুষের কর্মক্ষমতা, তার জ্ঞান এবং দক্ষতা উভয়ের এই সমন্বয় ও পারস্পরিক সম্পর্কে সৃষ্ট হয় উৎপাদিকা-শক্তি। (গ) বিষয়গত উৎপাদন করার জন্য মানুষকে সামাজিকভাবে সংগঠিত হতে হয় যা উৎপাদন সম্পর্ক নামে পরিচিত। সমাজের উৎপাদন সম্পর্কে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের উপর নির্ভরশীল। এই দুই-এর ঐক্যকে মার্কসীয় তত্ত্বে উৎপাদনপদ্ধতি বা উৎপাদনপ্রক্রিয়া বলা হয়।

উৎপাদন সম্পর্ক মানুষকে দু'টি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত করে—একটি শ্রেণী মালিকানা বা অন্য উপায়ে উৎপাদনের উপকরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্য শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা ভোগ না করলেও শ্রম-শক্তির সাহায্যে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। এই দুই শ্রেণীর অবস্থান পরস্পরবিরোধী, যেহেতু স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। এরই ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণীসংগ্রামের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব বিদ্যমান উৎপাদনপদ্ধতির উৎপাদনক্ষমতা নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত সংকটজনক বা বিস্ফোরক পর্যায়ে পৌঁছায় না। মার্কসবাদীদের মতে উৎপাদিকাশক্তির নূতন সম্ভাবনার পথে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হয় সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের মাধ্যমে। এভাবেই জন্ম নেয় নূতন উৎপাদনপদ্ধতি। আদিমসাম্যবাদী সমাজ থেকে দাসসমাজ, সামন্তসমাজ, পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ এই দ্বান্দ্বিক নিয়মেই চালিত।

মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণ মনে করেন, মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক এই অর্থে যে, সে তার জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে। এক্ষেত্রে বাস্তব জীবনই মুখ্য এবং চিন্তা-পরবর্তী কার্যক্রম যা জীবন দ্বারা অর্থাৎ সমাজজীবনের বাস্তব অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়। Preface : A Contribution to the Critique of Political Economy (১৮৫৯) এবং Capital গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে কার্ল মার্কস উল্লেখ করেন যে, মানুষ তাদের জীবনের সামাজিক উৎপাদনে তাদেরই ইচ্ছানিরপেক্ষ এবং আবশ্যিক এক উৎপাদন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, যে উৎপাদন সম্পর্ক তাদের বস্তুগত উৎপাদিকা-শক্তির এক উন্নত পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। উৎপাদন সম্পর্কের এই সামগ্রিক অবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বা প্রকৃত ভিত্ তৈরী করে যার উপরে আইনগত এবং রাজনৈতিক উপরি কাঠামো এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক চেতনা গড়ে ওঠে। বস্তুজীবনের উৎপাদন-পদ্ধতি সাধারণভাবে সামাজিক রাজনৈতিক এবং বৌদ্ধিক জীবনপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমাজের ভিত্তি হিসেবে এবং রাজনৈতিক কাঠামো এবং প্রক্রিয়াকে উপরি কাঠামো হিসেবে উল্লেখ করায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে অর্থনৈতিক নিয়তবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে সমালোচনা করা হয়। অর্থাৎ. রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোরই প্রতিফলন। মার্কসবাদী তত্ত্বকে এভাবে ব্যাখ্যা করা আসলে মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিক উপলব্ধি করতে অসমর্থ হওয়া। The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte গ্রন্থে কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার হুবহু প্রতিচ্ছবি হিসেবে না দেখে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেন। নিকোস পুলানৎজাস (Nicos Poulantzas) রাষ্ট্রে এই আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের বিরাটত্ব বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। J. M. Maquire-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী পুঁজিবাদীব্যবস্থা যেহেতু অপরিকল্পিত এবং প্রতিযোগিতামূলক, সেহেতু শ্রেণীপ্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এবং পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব নিরসনের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদীব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রে স্বাতন্ত্র্য প্রয়োজন।

(খ) আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভবের অন্যতম কারণ ছিল সাবেকি মূল্যবানসাপেক্ষ, প্রাতিষ্ঠানিক, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজনীতিচর্চার বিলোপ ঘটিয়ে মূল্যমানিরপেক্ষ, অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমৃদ্ধ রাজনীতিচর্চার সূচনা করা। আচরণবাদী তাত্ত্বিকগণ ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর রাজনৈতিক আচরণকে রাজনৈতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এবং রাজনীতির রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সংকীর্ণ পরিধিকে অতিক্রম করে ক্ষমতা, মূল্যবন্টন, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়গুলির উপরে গুরুত্ব দেন। শাসনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সব রকমের কাজকর্মকেই রাজনৈতিক আচরণ বলে ডেভিড ট্রুমান মনে করেন। হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল-এর রচনায় ক্ষমতার বিষয়টি, ডেভিড ইস্টন এর রচনায় মানের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দের বিষয়টি রাজনীতির মুখ্য বিষয় বলে বিবেচিত হয়। এই ধরনের বিষয়গুলি যেহেতু যে কোন সমাজ-সংগঠনেই লক্ষ্য করা যায়, সেহেতু রাষ্ট্রের পরিবর্তে যে কোন সমাজ-সংগঠনই আচরণবাদী আলোচনার ক্ষেত্র। রাষ্ট্রের পরিবর্তে এ কারণে রাজনৈতিক ব্যবস্থা শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হতে থাকে। দ্বিতীয়ত, আচরণবাদী তাত্ত্বিকগণ রাজনীতিচর্চাকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করতে চেয়েছেন। ফলে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি এবং বিশ্লেষণপদ্ধতিগুলি অনুকরণের মাধ্যমে রাজনীতিচর্চার শুরু হয়। রাজনীতি-বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ, তথ্যসংগ্রহ, পরিসংখ্যান, বিশ্লেষণ প্রমাণ প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তৃতীয়ত, আচরণবাদী তাত্ত্বিকগণ রাজনীতির বিশ্লেষণে মূল্যবোধের বিষয়টি বর্জন করতে চেয়েছেন এবং পরিবর্তে রাজনীতিবিজ্ঞানকে তথ্যনিষ্ঠ মূল্য-নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। চতুর্থত, আচরণবাদী তাত্ত্বিকগণ সামাজিক বিজ্ঞানগুলির আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ব্যক্তি-আচরণ তথা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সঠিক উপলব্ধির জন্য মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানের শাখাগুলির মূলসূত্রগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। এ ব্যাপারে ডেভিড ইস্টন মন্তব্য করেন, একটি সমাজের সামগ্রিক মূল্যবোধের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ করতে গেলে রাজনীতিবিজ্ঞানকে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সাহায্য নিতে হবে।

ডেভিড ইস্টন আচরণবাদের আটটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। সেগুলি হ'ল— (১) আচরণের নিয়ম অনুসন্ধান (২) সত্যতা প্রমাণ (৩) শৃঙ্খলাবদ্ধ গবেষণাপদ্ধতি (৪) পরিমাপপদ্ধতির ব্যবহার। (৫) মূল্যমান

নিরপেক্ষতা (৬) গবেষণা প্রণালীর উদ্ভব (৭) বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রচনা এবং (৮) সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সংহতিসাধন।

আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে রাজনীতিচর্চায় কতকগুলি বিশ্লেষণ ধারা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে। এই বিশ্লেষণ ধারাগুলি হ'ল ডেভিড ইস্টন-এর ব্যবস্থাপক বিশ্লেষণ ধারা (system Analysis), আলমন্ড (Almond), কোলম্যান (Coleman), পাওয়েল (Powell) প্রমুখ তাত্ত্বিক-এরা কাঠামোকার্যাবলী বিশ্লেষণধারা (Structural Functional Analysis), ডেভিড ট্রুম্যান (David Truman). ডেভিড আপ্টার (David Apter) প্রমুখ তাত্ত্বিকদের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বিশ্লেষণধারা (Group Analysis), কার্ল ডয়েশ (Karl Dertsch)-এর যোগাযোগ তত্ত্ব (communication theory)।

সীমাবদ্ধতা ঃ সত্তরের দশকে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, পঞ্চাশ ও ষাটের দশক হ'ল আচরণবাদের সুবর্ণযুগ এবং পরবর্তী দশক থেকেই শুরু হয় আচরণবাদের প্রতি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া, এমনকি আচরণবাদের সমর্থক ডেভিড ইস্টন আচরণবাদের সীমাবদ্ধতাগুলি সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির যে সমস্ত সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করা হয় তা হ'ল নিম্নরূপ—

(১) আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পদ্ধতি সর্বস্বতা (২) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির নামে মূল্যমাননিরপেক্ষতা, যা ব্যক্তি সমাজজীবনের বিশ্লেষণে আদৌ সম্ভবপর নয়। (৩) রক্ষণশীলতা তথা বিদ্যমান পুঁজিবাদী কাঠামো ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার প্রবণতা (৪) রাজনীতির মূল ধারণাগুলি, যথা, স্বাধীনতা, সাম্য, আনুগত্য, বিদ্রোহ প্রভৃতি বিষয়গুলির গুরুত্বহীনতা (৫) ইতিহাসনিরপেক্ষতা (৬) লক্ষ্যহীনতা (৭) সমাজপরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার অক্ষমতা প্রভৃতি।

১৯৭০ এর দশক থেকেই আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপরোক্ত সীমাবদ্ধতারা বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। স্বাধীনতা, সাম্য, আনুগত্য, সার্বভৌমিকতা প্রভৃতি ধারণাগুলি, যা আচরণবাদীরাও সাবেকি বলে বর্জন করেছেন, পুনরায় রাজনীতিচর্চায় বিবেচিত হতে থাকে। *সত্তরের দশকে জন রলস (John Rawls)-এর A Theory of Justice, রবার্ট নজিক (Robert Nowzick)-এর Anarchy State and Utopia ৮০-র দশকে ফ্রাঙ্ক কানিংহাম (Frank Cunningham)-এর Democratic Theory and Socialism প্রভৃতি গ্রন্থগুলি আচরণবাদীতত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলি কাটিয়ে রাজনীতিবিশ্লেষণে পুনরায় দার্শনিক ও মূল্যমান দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। যদিও তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য যথেষ্টই ছিল। অবশ্য সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত ভার্জিনিয়া গোষ্ঠীর নির্বাচকমণ্ডলী, সরকারী কর্মচারী, প্রাধান্যবিস্তারকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী, রাজনীতিবিদ্‌দের আচরণ প্রভৃতি বিশ্লেষণে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গিকে Public choice approach বা Rational choice approach নামে অভিহিত করা হয়। প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডাউনস (Downs), ওলসন (Olson) এবং নিসকানেন (Niskanen)। এই সমস্ত তাত্ত্বিকগণ রাজনীতির বিশ্লেষণে অর্থনীতিশাস্ত্রের অনুসৃত তত্ত্ব ও মডেলগুলি ব্যবহারেও অত্যন্ত তৎপর।

(গ) নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

সাবেকি এবং আধুনিক-রাজনীতিচর্চার উভয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমালোচনায় মুখর ১৯৬০-এর দশকে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিটি রাজনীতিচর্চায় ক্রমশ প্রাধান্য বিস্তার করে তা হ'ল নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। নারীজাতির সামাজিক

অবস্থার উন্নয়ন বা সমান অধিকার তাঁদের আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নারীবাদীগণ এযাবৎকাল পর্যন্ত রাজনীতিচর্চায় সংযুক্ত মূল দৃষ্টিভঙ্গিকেই আক্রমণ করেন। পঞ্চদশ শতকে পিসানের (Christian de Pisan) of the city of Ladice, অষ্টাদশ শতকে মেরী উলস্টোন ক্রাফট (Mary Wollstonecraft, Vindication of Rights of Women প্রভৃতি রচনা বা ঊনবিংশ শতকে নারীর ভোটাধিকার এবং অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আন্দোলনের মধ্যে নারীস্বাধীনতার বিষয়টি উপস্থাপিত হ'লেও রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে নারীবাদী ১৯৬০-এর দশকে এক নূতন তাৎপর্য লাভ করে। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত Betty Friedan-এর The Feminist Mysteque বা ১৯৭০ সালে প্রকাশিত Kate Millett-এর Sexual Politics গ্রন্থে নারী-পুরুষ সম্পর্ককে রাজনৈতিক প্রাধান্যের সম্পর্ক বলে অভিহিত করা হয়।

ধ্রুপদী রাজনীতিচর্চায় পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলিকে রাজনীতির আওতার বাইরে রাখা হ'ত। নারীবাদীদের মতে উক্ত ক্ষেত্রগুলিতেও যেহেতু ক্ষমতার সম্পর্ক বিদ্যমান, সেহেতু রাজনীতির আলোচনার বিষয়বস্তু। 'এযাবৎকাল বিদ্যমান সামাজিক ইতিহাস হ'ল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস'—পুরুষ কর্তৃক নারীকে শোষণের ইতিহাস। সুতরাং এই শোষণের উৎসসন্ধান, ক্ষমতাপ্রয়োগের ধরন, মতাদর্শের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়গুলি লিঙ্গ রাজনীতির (Gender Politics) -এর মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। উদারনৈতিক নারীবাদ (Liberal Feminism), বৈপ্লবিক নারীবাদ (Radical Feminism), মার্কসীয় নারীবাদ (Marxian Feminism), বস্তুপরিবেশবাদী নারীবাদ (Eco–feminism)—প্রভৃতি বিভিন্ন ধারা নারীবাদী বক্তব্যের মধ্যে গড়ে উঠলেও কতকগুলি ব্যাপারে ঐক্যমত্য দেখা যায়।

নারীবাদের প্রবক্তাগণ শ্রেণী, ধর্ম, গোত্র, নৃজাতি (Ethnic Group) প্রভৃতির ন্যায় লিঙ্গকেও (Gender) এক সামাজিক বর্গ হিসেবে দেখেন এবং শ্রেণী-রাজনীতির ন্যায় লিঙ্গ-রাজনীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। প্রচলিত রাজনীতিচর্চা মূলত পুরুষদের দ্বারা, পুরুষদের জন্য, পুরুষদের স্বার্থে পরিচালিত; নারীর অবস্থানের বিষয়টি সেখানে অনুপস্থিত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পরিবারের কর্তৃত্ব থাকে পুরুষের হাতে। অনুরূপভাবে, সমাজের অন্যান্য সংস্থাতেও পুরুষের প্রাধান্যই বজায় থাকে। পরিবারের ন্যায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও পিতৃতান্ত্রিক। শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, রাজনীতি প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের অংশগ্রহণ ও প্রাধান্য স্বীকৃত। মিলেট (Millett)-এর মতে, পরিবারের ভিতরে ও বাইরে উভয়ক্ষেত্রেই পিতৃতান্ত্রিকতা কাজ করে। পিতৃতান্ত্রিকতার দুটি নীতি হ'ল (১) পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্ব করে, (২) বয়ঃজ্যেষ্ঠরা কনিষ্ঠদের উপর কর্তৃত্ব করে। এভাবে পিতৃতন্ত্র এক লিঙ্গভিত্তিক স্তর-বিন্যাসের জন্ম দেয়। ভারতীয় সমাজে ভ্রূণ শিশুকন্যা হত্যা, পণপ্রথা, বধূ-নির্যাতন প্রভৃতি ঘটনাগুলি এই পুরুষশাসিত সমাজেরই বহিঃপ্রকাশ। এই পুরুষতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ, সময়; কিভাবে এর অবসান ঘটবে—সে সম্পর্কে অবশ্যনারীবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়ত, সমাজে নারী ও পুরুষের পার্থক্যকে সাধারণত প্রকৃতিবিজ্ঞানের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত বলে ব্যাখ্যা করা হয় এবং এই সিদ্ধান্তে আসা হয় যে,সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা প্রকৃতি দ্বারাই নির্ধারিত। নারীর মুখ্য ভূমিকা সন্তানপ্রজনন, প্রতিপালন। তাছাড়া শারীরিক দিক থেকে দুর্বল বলে (weeker sex) নারী গৃহকর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। সেবা, সহানুভূতি, ধৈর্য প্রভৃতি নারীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে শারীরিক দিক থেকে সবল পুরুষ (stronger sex) যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক কার্যসম্পাদন, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ,

সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে যুক্ত থাকবে। নারাবীদে নারী ও পুরুষের এই তথাকথিত প্রকৃতিপ্রদত্ত ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়। এ ব্যাপারে নারীবাদীগণ যৌন (sex) এবং লিঙ্গ (Gender) এই দুই এর মধ্যে পার্থক্য করেন। যৌনগত দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য প্রকৃতিপ্রদত্ত। তাছাড়া মাতৃত্বের বিষয়টিও নারীর সামাজিক মর্যাদা কমায় না, বরং বাড়ায়। বলা হয়, নারীর মা হওয়ার তথা নারীর প্রজনন ক্ষমতায় ভীত পুরুষ চায় নারীকে অবদমিত রাখতে। প্রকৃতিগত এই ভিন্নতা ছাড়া নারী ও পুরুষের মধ্যে যে সামাজিক,অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তা সমাজসৃষ্ট এবং তা পুরুষের স্বার্থেই এবং এই পার্থক্যকে লিঙ্গ (Gender)-ভিত্তিক পার্থক্য বলা হয়। সাঁমো দ্য ব্যভিয়ার মন্তব্য করেন, নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ কেউ নারী হয়ে ওঠে অর্থাৎ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারীর ভূমিকাকে পুরুষের স্বার্থে গড়ে তোলা হয়। ফলে, সাহস, দক্ষতা, অধিগ্রাহী প্রভৃতি গুণগুলি থেকে নারী বঞ্চিত হয়; পুরুষও সহনশীলতা, ধৈর্য, আবেগ প্রভৃতি গুণগুলি থেকে বঞ্চিত হয়।

রাজনীতির লক্ষ্য সম্পর্কে অবশ্য নারীবাদী তাত্ত্বিকগণ একমত পোষণ করেন না। উদারনৈতিক নারীবাদীগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। অপরদিকে, আর এক গোষ্ঠী রয়েছেন যাঁরা নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের পরিবর্তে, সমাজকে নারী-পুরুষ হিসেবে দ্বিখণ্ডিতকরণের পরিবর্তে চান মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের বিকাশ,যেখানে লিঙ্গভিত্তিক সমাজ ও সামাজিক ভূমিকার পৃথকীকরণ ঘটবে না। অপরদিকে, আর এক দল তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা পুরুষ ও নারীর প্রকৃতিগত বিভাজনকে মেনে নিয়ে নারী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এই সমস্ত তাত্ত্বিকদের মতে, পুরুষের অধিকারগুলি রপ্ত করা, পুরুষের মতো হয়ে ওঠা আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকেই পরোক্ষভাবে মেনে নেওয়া। এর মানে নারীসত্ত্বার বিলোপ ঘটে। নারী সত্ত্বার বিলোপের পরিবর্তে,এ্যাটকিনসন (Atkinson) বা সুশান ব্রাউন মিলার (Susan Brown Miler)-এর ন্যায় তাত্ত্বিকগণ চান প্রকৃতিগতভাবে নারী হয়ে ওঠা। আধিপত্য এবং আগ্রাসন যদি পুরুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে পুরুষকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা এবং পুরুষ ও পুরুষশাসিত সমাজ থেকে নারীদের বিযুক্ত করা। 'নারীবাদ হ'ল তত্ত্ব, সমকামিতা তার প্রয়োগ'—এই হ'ল উপরোক্ত তাত্ত্বিকদের বক্তব্য। ফায়ারস্টোন (Firestone) 'নারীদের সন্তান-প্রজননের কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে যুক্তি প্রদর্শন করেন। অপরদিকে এঙ্গেলসকে (Engels) The Origin of Family Private Property and the State অনুসরণ করে সমাজতন্ত্রী নারীবাদীগণ বলেন, ঐতিহ্য অনুসারী পিতৃতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ও মালিকানাকে সুরক্ষিত করার জন্য। রাজনীতি থেকে মুক্ত সন্তান প্রজনন ও গৃহকর্মের সঙ্গে যুক্ত নারীর ধারণা প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদকেই সুরক্ষিত করে। সন্তান-প্রজনন ও প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রম সরবরাহের দায়িত্ব নেয় নারীরাই। আবার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পুরুষ ও নারীর পৃথক ভূমিকাকে চিহ্নিত করায় পুঁজিবাদী পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। গৃহকর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে নারী প্রতিদিন যথাসময়ে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিয়ে স্বামী তথা শ্রমিককে কর্মক্ষেত্রে পাঠায়। স্বামীর পক্ষেও একটা ভালো চাকুরি অত্যন্ত দরকারী হয়ে পড়ে স্ত্রী ও সন্তানের জন্য। এভাবেই পুঁজিবাদী সমাজ তার অর্থনৈতিক দক্ষতাকে ধরে রাখে। সুতরাং পুঁজিবাদের ধ্বংস না হ'লে নারীমুক্তিও সম্ভবপর নয়। এ কারণে সমাজতন্ত্রী নারীবাদীগণ লিঙ্গ ও শ্রেণী উভয় শোষণ থেকেই মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার পক্ষপাতী।

১৯৮০-র দশক থেকে নারীবাদী আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকে। (১) লক্ষ্যমাত্রার ভিন্নতা (২)

রক্ষণশীলবাদের উদ্ভব তথা সমাজশৃঙ্খলা, নারীর ঐতিহ্যগত ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ (৩) নারীবাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্যগুলির অধিকাংশই পূরন হওয়ায় নারীবাদী আন্দোলনের তীব্রতা ৭০ -এর দশকের তুলনায় পরবর্তী দশকগুলিতে উন্নত দেশগুলিতে হ্রাস পেলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যতদিন থাকবে নারী-পুরুষ সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়নের প্রশ্নটিও থেকে যাবে।

(ঘ) বাস্তু-পরিবেশ তাত্ত্বিক (Ecological) দৃষ্টিভঙ্গি

এ পর্যন্ত আমরা রাজনীতিচর্চার যে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি আলোচনা করলাম তা মানুষকেন্দ্রিক (Anthropocentric)। প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গিই ব্যক্তি-অবস্থান, ব্যক্তি-সমাজের সম্পর্ক, সমাজবিকাশের ধারা, সমাজ-পরিবর্তন এক কথায় ব্যক্তি-সমাজকেই দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। ব্যক্তি ও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ যেমন, শ্রেণী, জাতি নৃজাতিগোষ্ঠী (Ethnic Group) জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্র—প্রভৃতি রাজনীতিচর্চার অন্যতম বিষয়। ব্যক্তি-প্রয়োজন ও ব্যক্তি-স্বার্থকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্ক বিষয়ে যে সমস্ত ধারণাগুলি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যেমন, স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়, সমাজশৃঙ্খলা, আইন, আনুগত্য—রাজনীতিচর্চায় মূল আলোচিত বিষয়। একত্ববাদ অথবা বহুত্ববাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ—যে কোন মতাদর্শই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ১৯৬০ -এর দশকে এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি অত্যন্ত একপেশে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ও সংকীর্ণ বলে সমালোচিত হ'তে থাকে বাস্তু-পরিবেশবাদীদের (Ecologist) দ্বারা। বাস্তু-পরিবেশবাদীগণ Eco-র বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে পরিবেশ শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু, পরিবেশ শব্দটি আবার আমরা Environment-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করি। অথচ Eco শব্দটির অর্থ আরো ব্যাপক। ব্যক্তি, পরিবেশ (বস্তুগত ও জীবগত) ব্যক্তি-প্রকৃতি সম্পর্ক সবকিছুই Eco শব্দটির দ্যোতক যার বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে বাস্তু-পরিবেশ শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে। রাজনীতির বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হয় যেখানে ব্যক্তিই একমাত্র আলোচ্য বিষয় নয়—গোটা বিশ্ব-প্রকৃতিই আলোচ্য বিষয়।

১৯৬০-এর দশকের আগে পরিবেশ-পরিমণ্ডল নিয়ে যে ভাবনাচিন্তা হয়নি তা নয়। কিন্তু, অধিকাংশ বক্তব্যেই প্রকৃতিকে দেখা হয়েছে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে অপরিহার্য অফুরান যোগানদার হিসেবে। জন লক, অ্যাডাম স্মিথ, কার্ল মার্কস প্রত্যেকেই প্রকৃতিকে ব্যক্তির সম্পদ আহরণের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন; অতিরিক্ত উৎপাদনের মাধ্যমেই ব্যক্তির প্রয়োজন মোকাবিলার কথা ভেবেছেন। প্রকৃতির উপর ব্যক্তি শ্রম প্রয়োগে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তার মালিকানা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক দেখা গেছে, কিন্তু প্রকৃতিকে নির্বিচারে ব্যবহার করার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন দেখা দেয়নি। ঊনবিংশ শতকে কিছু দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক (যেমন, রবীন্দ্রনাথ) নির্বিচারে প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব, শিল্পায়ন ঘটেছে তার বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন এবং রোমান্টিক অরণ্যের দিনে ফিরে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে কোন তত্ত্ব উদ্ভুত হয়নি। বেন্থাম, জেমস মিল প্রমুখ দার্শনিকগণ ব্যক্তির সুখলিপ্সাকেই প্রধান বিবেচ্য বলে ধরে নিয়েছেন এবং এই সুখলিপ্সাকেই (সুখের বৃদ্ধি, যন্ত্রণার হ্রাস) চরিতার্থ করার জন্য প্রকৃতিকে বশে আনার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিরও মূল লক্ষ্য ছিল প্রকৃতিকে জানা, ব্যক্তির প্রয়োজমে প্রকৃতিকে ব্যবহার করা। বলা যেতে পারে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত র‍্যালে কার্সনের (Rachel Carson) The silent springs গ্রন্থটি প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের ফল সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে। প্রকৃতিকে

যথেচ্ছব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পায়ন, অরণ্য ও বন্য জন্তুর ধ্বংস, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমহ্রাসমান অবস্থা, পরিবেশবাদ এক রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় জার্মানীতে রাজনৈতিক দলগুলির উদ্ভব ঘটতে থাকে পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচি নিয়ে। অন্যান্য দেশেও রাজনৈতিক দলগুলি পরিবেশের বিষয়টি রাজনৈতিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে থাকে। বাস্তু-পরিবেশবাদীগণ রাজনীতিকে নূতন করে ব্যাখ্যা করেন; ডান বা বাম রাজনীতির পরিবর্তে সামনে এগিয়ে যাবার রাজনীতি (Neither left nor right but ahad)-র কথা বলেন। ফিকে সবুজ (Light Green), গাঢ় সবুজ (Dark Green), রক্ষণশীল (Conservative), সমাজতান্ত্রী (Socialist), নারীবাদী (Feminist), বাস্তু-পরিবেশবাদীগণের মধ্যে বক্তব্যের ভিন্নতা থাকলেও কয়েকটি ব্যাপারে ঐকমত্য দেখা যায়।

প্রথমত, বাস্তু-পরিবেশবাদীগণ ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের নবজাগরণ, জ্ঞানদীপ্তযুগের সাফল্যের মূল বক্তব্যের সমালোচনা করেন—ব্যক্তিকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন জীব হিসেবে, প্রকৃতির প্রভু হিসেবে দেখার পরিবর্তে বিশ্ব -পরিমণ্ডলের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেন। এই সামগ্রিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ব্যক্তির সঙ্গে প্রকৃতিপরিমণ্ডলের সম্পর্ক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার-ব্যক্তি প্রকৃতিরই অংশ। রাজনীতিচর্চায় ব্যক্তির উপর একমাত্র গুরুত্ব আরোপের ফলে ব্যক্তির সঙ্গে প্রকৃতির এবং অন্য প্রাণী-জগতের সম্পর্কের বিষয়টি বিকৃত এবং অবহেলিত হয়েছে। বাস্তু-পরিবেশবাদীগণ ব্যক্তি বা ব্যক্তির চাহিদা থেকে রাজনীতির আলোচনা শুরু করার পরিবর্তে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন প্রাণী ও পরিবেশের এক সামগ্রিক কাঠামোর বিশ্লেষণ থেকে আলোচনা শুরু করেন।

দ্বিতীয়ত, রাজনীতিচর্চায় ব্যক্তিজীবনের সম্ভাবনা ও প্রাকৃতিক সম্পদের যোগানকে অপর্যাপ্ত বলে ধরা হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির পক্ষে সৃজনক্ষমতা ও সমৃদ্ধি সীমাহীন। বাস্তু-পরিবেশবাদীরা এই ভাবনাকে সমৃদ্ধির বাতিক (Growth mania) বলে ব্যঙ্গ করেন। প্রাকৃতিক সম্পদ অপর্যাপ্ত নয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা হিসেবে করে দেখিয়েছেন, যে হারে তৈল সম্পদ ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে বিশ্বে ৪৫-৮০ বৎসরের মধ্যে তৈল সম্পদ শেষ হয়ে যাবে। অন্যান্য প্রকৃতিক খনিজ সম্পদও শেষ হওয়ার মুখে। অথচ, প্রতি মিনিটে ১৫০ জন শিশু জন্ম নিচ্ছে। এমতাবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত না করলে, জন্মনিয়ন্ত্রণ না করলে অচিরেই মানবসভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিঃসন্দেহে উৎপাদনের ও ভোগ্যপণ্যের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে; কিন্তু একই সঙ্গে নূতন করে বহু সমস্যা সৃষ্টি করেছে। উন্নয়নের মাত্রাকে শূন্যাঙ্কে (zero growth) নামিয়ে আনা, পরিবেশ—দূষণকারী শিল্পায়নকে স্থগিত রাখা, টিকে থাকার অর্থনীতি চালু করা, স্থানিক প্রয়োজনভিত্তিক উৎপাদন চালু করা—ইত্যাদির মাধ্যমেই মানবপ্রজাতি টিকে থাকতে পারে।

তৃতীয়ত, বর্তমান প্রজন্মই সাধারণত রাজনীতির মূল আলোচ্য বিষয়। কিন্তু বাস্তু—পরিবেশবাদীরা আগামী প্রজন্মের কাছেও দায়বদ্ধতা স্বীকার করেন। প্রাকৃতিক সম্পদ যদি এই প্রজন্মেই বেহিসেবী ব্যবহারের ফলে শেষ হয় তাহলে আগামী প্রজন্মের কাছে আমরা রেখে যাব এক সম্পদহীন, নিঃস্ব, দূষণপূর্ণ জগৎ।

চতুর্থত, বেন্থাম, জেমস মিথ প্রমুখ রাজনীতিবিজ্ঞানীগণ রাজনীতির অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে সুখের বৃদ্ধি ও যন্ত্রণার হ্রাসকে ধার্য করেন। বলাবাহুল্য, এই সুখ—যন্ত্রণার বিষয়টি উপরোক্ত তাত্ত্বিকগণ শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন। বাস্তু—পরিবেশবাদীরা শুধুমাত্র মানুষের পরিবর্তে অন্যান্য প্রজাতির সুখবৃদ্ধি ও যন্ত্রণালাঘবের বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে মানুষের মত অন্যান্য জন্তুদেরও বাঁচার অধিকারের

বিষয়টি রাজনীতিতে এসে যায়। প্রাণীহত্যা, বৃক্ষচ্ছেদন প্রভৃতি বিষয়গুলিও অপরাধমূলক বলে বিবেচিত হতে থাকে।

সর্বোপরি বাস্তু—পরিবেশবাদীগণ রাজনীতিকে মূল্য—নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে তোলার পরিবর্তে মূল্যসাপেক্ষ বিজ্ঞান হিসাবে গড়ে তুলতে চান। এ কারণে নৈতিক বিষয়টি বাস্তু—পরিবেশবাদীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে, অন্যান্য প্রজাতির কাছে, মানবপ্রজাতির এক দায় রয়েছে। এর জন্য মানুষকে তার ভোগস্পৃহা কমানো, সবার বাঁচার ও বিকশিত হওয়ার অধিকারকে মেনে নেওয়া। সমাজের অবহেলিত এবং দমিত জনগোষ্ঠী (যেমন নৃজাতিগোষ্ঠী, নারীজাতি) -র অধিকার পুরো মাত্রায় স্থান দেওয়া, ব্যক্তির চাহিদাকে নুতনভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রভৃতি বিষয়গুলি বাস্তু—পরিবেশ রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়। রাজনীতি সম্পর্কে এক ধরনের নৈতিক / আধ্যাত্মিক ভাবনা বাস্তু-পরিবেশবাদীদের বক্তব্যে লক্ষ্য করা যায়—ব্যক্তি, অন্য ব্যক্তি, প্রাণী, গোটা বিশ্বজগতের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায় এবং এভাবে বিশ্ব আত্মার সঙ্গে একাত্মবোধ করে। ডবসনের (Dobson) Green Political Thought গ্রন্থে বাস্তু-পরিবেশবাদীদের এই মানবপ্রকৃতির গুণগত পরিবর্তনের বক্তব্যটি বর্তমানে ভোগ্যবাদী দুনিয়ার কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ আবেদন এবং একই সঙ্গে এই তত্ত্বের এক দুর্বলতম দিক। তাছাড়া বাস্তু পরিবেশবাদীগণ পুঁজিবাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল সম্পর্কেও কম সোচ্চার। সমাজপরিবর্তনের মুখ্যভূমিকা কে নেবে সে প্রশ্নেও বাস্তু-পরিবেশবাদীদের বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(১) কিভাবে আপনি রাজনীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ণয় করবেন?

(২) রাজনীতিবিজ্ঞানের অনুশীলনে বিভিন্ন সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করুন।

(৩) রাজনীতিবিজ্ঞানের অনুশীলনে বিভিন্ন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করুন।

(৪) আপনি কি মনে করেন রাজনীতিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

(৫) রাজনীতিবিজ্ঞানের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) রাজনীতিবিজ্ঞান অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে সাবেকি এবং আধুনিক — এই দুইভাগে ভাগ করা কতদূর যুক্তিযুক্ত?

(২) আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

(৩) রাজনীতির বিশ্লেষণ কি মূল্যনিরপেক্ষ হওয়া উচিত?

(৪) রাজনীতির সম্পর্কে নারীবাদীদের বক্তব্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

(৫) রাজনীতি সম্পর্কে বাস্তু-পরিবেশবাদীদের বক্তব্য আলোচনা করুন।